দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৩৯ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২

# বৌদ্ধধর্ম-দর্শনে ক্ষান্তি পারমিতত্ত্ব : একটি পর্যালোচনা

মো. আশিকুজ্জামান খান কিরন*

**সার-সংক্ষেপ**

'ক্ষান্তি' শব্দটি বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে অত্যন্ত পরিচিতি শব্দ হলেও প্রায় সকল প্রকার প্রধান প্রধান ধর্ম-দর্শনে এর প্রয়োগ রয়েছে। সাধারণভাবে এর ব্যবহার একই রকম হলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ধর্ম ও দর্শন বিশেষে ভিন্নতা থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে এর দুই ধরনের প্রয়োগই লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে শব্দটির সাধারণ অর্থে প্রয়োগের পাশাপাশি বিশেষ অর্থেও প্রয়োগ হয়ে থাকে। বিশেষ অর্থে 'ক্ষান্তি' শব্দটির সাথে 'পারমি' শব্দটির যোগসূত্রতা রয়েছে। আবার 'পারমি' শব্দের সাথে বোধিসত্ত্ব, বোধিচর্যা ও বোধিচর্যাবতারের কথা আলোচনায় ওঠে আসে। কাছাকাছি বা নৈকট্যের দিক থেকে বোধিসত্ত্ব, বোধিচর্যা ও বোধিচর্যাবতার শব্দগুলো ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। 'পারমি' পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে অথবা যিনি পারমির চর্যা করেন তাকে বোধিসত্ত্ব বলে আখ্যায়িত করা হয়। বোধিসত্ত্বগণ যে চর্যারীতি অনুশীলন করেন 'পারমি' সম্পাদনে তাকে বোধিচর্যা বলা হয়। বোধিচর্যাবতার হিসেবে চিহ্নিত হতে হলে তাকে বোধিচর্যা প্রক্রিয়ায় অবতীর্ণ হতে হয়। আর এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনেরপ্রধান দু'টি ভাগ হীনযান ও মহাযানের যথাক্রমে দশ ও ছয় পারমির চর্যা করা হয়ে থাকে। উভয় ভাগের মধ্যে 'ক্ষান্তি' একটি সর্বজনীন পালনীয় 'পারমি'। যা উভয় পক্ষই অনুশীলন করে থাকেন এবং গৃহী জীবনের বিধি-বিধান পালন ও যারা নির্বাণ লাভ করতে ইচ্ছুক তাঁদের নির্বাণ লাভের জন্য এটির চর্চা আবশ্যক। যার অনুশীলন বুদ্ধ স্বয়ং নিজেই করেছেন। যেগুলোর বর্ণনা বৌদ্ধগ্রন্থ '*চরিয়া পিটকে*' উল্লেখ রয়েছে। ক্ষান্তির চর্যা বা চর্চা উভয় জীবনের জন্য মহৎ ও কল্যাণকর যা বলার অবকাশ রাখে না। আরও পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, এটি ধর্মের জন্যও যেমন কল্যাণকর তেমনি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যেমন ক্ষান্তির অনুশীলন প্রয়োজন তেমনি একটি সুন্দর সমাজ ও ধৈর্যশীল জাতি বিনির্মাণে ক্ষান্তির অনুশীলন বা চর্চা অপরিহার্য।

## ১. ভূমিকা

'ক্ষান্তি' বা ক্ষমা ধৈর্যশীলতারই অপর একটি মূল্যবান নাম ও মহৎ গুণ। সাধারণভাবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় 'ক্ষান্তি' একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে পরম সুখ লাভের জন্য এটির চর্চা বা অনুশীলন করা হয়ে থাকে। যার সামগ্রিক

* সহাকারী অধ্যাপক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চর্চার মাধ্যমে সেই সুখের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই দু'টো ফলকে লক্ষ্য রেখেই এর অনুশীলন হয়ে থাকে। 'ক্ষান্তি' চর্চায় যদি এতটুকু দুঃখ থাকে তা নিশ্চয় নরক দুঃখ বা নরক যন্ত্রণার ন্যায় তেমনটা ভয়ঙ্কর নয়। বরং এটি মহার্থ সাধক বলা যায়। যে দুঃখ মহার্থ সাধক, সাংসারিক সকল দুঃখের হরণ করতে পারে, সেই দুঃখে দুঃখিত বা কষ্টিত না হয়ে প্রীত বা সুখী হওয়াই যুক্তিসঙ্গত হবে। এই প্রীতি-সুখ অনিন্দ্যও সুখজনক। এই জাতীয় সুখভোগ গুণশীল ব্যক্তির পক্ষে নিষিদ্ধ নয় বরং প্রশংসনীয়। তাই অপরকে আকৃষ্ট করার জন্য ক্ষান্তির সাধনা বা অনুশীলন বড়ই উত্তম। 'ক্ষান্তি' পারমিতত্ত্বের চর্চার মধ্যে দিয়ে যেমন ধর্মীয় জীবন সুন্দর ও সুখের হয় তেমনি এটির চর্চা বা অনুশীলন সমাজ ও জাতীয় জীবন সুন্দর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নিম্নে 'ক্ষান্তি' পারমিতত্ত্বের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো।

## ২. পারমিতত্ত্ব

'পারমিতত্ত্ব' বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত এবং বৌদ্ধ জীবন চর্যার মহামূল্যবান সোপান স্বরূপ মূল্যায়িত হয়ে থাকে। বৌদ্ধগণ আদর্শিক জীবন চর্যার জন্য পারমিতত্ত্বের অনুশীলনে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকেন। এর কারণ স্বরূপ বলা হয় 'পারমিতত্ত্ব' হলো একটি সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি, যেটি মানুষকে শুভ ও ভালো কাজে উৎসাহী করে তোলে এবং শুভ কর্মফলের অধিকারী করে নৈর্বাণিক পরম শান্তির পথে পরিচালিত করে।

বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের অত্যন্ত মূল্যবান বিষয় হলো 'পারমিতত্ত্ব'। যেটির সন্ধান দিয়েছেন তথাগত গৌতম বুদ্ধ। তাঁর জীবন চর্যার মাধ্যমে তিনি যে সাধন মার্গে সিদ্ধি লাভোত্তর অমূল্য দর্শন তত্ত্বের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন সেই সামগ্রিক দর্শনের একটি বিষয় হলো 'পারমিতত্ত্ব'। সহজ করে বলা যায় যে, অপ্রমেয় পরম জ্ঞান সম্পন্ন সম্বোধি বা বুদ্ধত্ব অর্জনের পথ এই 'পারমি' সাধনাতেই নিহিত। কিন্তু সাধারণ, স্বাভাবিক জীবনেও এর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। বৃহত্তর জনসমাজ বা সর্বজনীনভাবে অনুশীলনীয় বহু বিষয়ও এই পারমিতত্ত্বের মধ্যে রয়েছে। পারমির অনুশীলন মানুষকে নিষ্কলুষ এবং শান্তিময় জীবনের পথে পরিচালিত করে। অতএব শুধু বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে নয়, বরং অনেকেই মনে করেন সর্বজনীন সমন্বিত আদর্শিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনেও পারমিতত্ত্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে পারমিতত্ত্বকে অন্যতম জীবন দর্শনও বলা যায়। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের প্রধান দুই ভাগ হীনযান ও মহাযানের মধ্যে পালনীয় পারমির সংখ্যার ব্যবধান রয়েছে। হীনযানে পারমির সংখ্যা মোট দশটি। যথা: ১. দান, ২. শীল, ৩. নৈষ্ক্রম্য, ৪. প্রজ্ঞা, ৫. বীর্য, ৬. ক্ষান্তি, ৭. সত্য, ৮. অধিষ্ঠান, ৯. মৈত্রী ও ১০. উপেক্ষা। তবে মহাযানে এর

সংখ্যা ছয়টি। যথা: ১. দান, ২. শীল, ৩. ক্ষান্তি, ৪. বীর্য, ৫. ধ্যান ও ৬. প্রজ্ঞা।হীনযান ও মহাযান উভয় ক্ষেত্রেই 'ক্ষান্তি' পারমির চর্চা ও অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে করা হয়ে থাকে।

**৩. ক্ষান্তি**

চিত্তের অ-বিভ্রান্ত স্থায়ী মৈত্রী-করুণাভাবই 'ক্ষান্তি'। "সংসারে মানবতার পরিপন্থী যত প্রকার অশুভ শক্তি আছে- ক্রোধ তাদের মধ্যে প্রধান। ক্রোধের আগুনে যেন সংসারে দাবানল সৃষ্টি হতে না পারে, সেজন্য মানবতার সাধককে সর্ব অবস্থায় 'ক্ষান্তি' বা ক্ষমাশীলতা অনুশীলন করতে হবে। অপরে তোমাকে যতই গালি-গালাজ দিক না কেন বা তোমার প্রতি দূর্ব্যবহার করুক না কেন তোমাকে প্রতিহিংসা গ্রহণে বিরত থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, তার বিরুদ্ধে কোনও অসদিচ্ছা বা প্রতিহিংসার ভাব পর্যন্ত পোষণ করতে পারব না। এটির নামই ক্ষান্তি" (জ্যোতি পাল, ১৯৯৮ : ২৯)।

অন্যায়, অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও করুণা দেখিয়ে অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়া ও তার প্রতি সহনশীলতা ও উদারতা প্রদর্শন করাকে 'ক্ষান্তি' বা ক্ষমা বলে অভিহিত করা হয়। ক্ষমা করে দেওয়ার মধ্যে মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। অন্যভাবে বলা যায়, 'ক্ষান্তি' হলো বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে অনুশীলিত পারমির নাম। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে হীনযানের[১] রয়েছে দশটি পারমি এবংমহাযানের[২] রয়েছে ছয়টি পারমি। দু'টো প্রধান ভাগের 'ক্ষান্তি' একটি সর্বজনীন পারমী[৩] হিসেবে স্বীকৃত। উক্ত দর্শনমতে সহনশীলতার সাধনাকেই 'ক্ষান্তি' বলা হয়। বিরতি, নিবৃত্তি, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি ক্ষান্তির সমার্থক শব্দ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

'ক্ষান্তি' নির্ণয়ে আরো বলা যায়, ক্ষান্তির অর্থ ক্ষমা। অগ্নি যেমন তৃণ কাষ্ঠাদি দগ্ধ করে, তদ্রূপ দেষাগ্নিও কল্পকাল পর্যন্ত সুচরিত বা কুশল কর্মসমূহ নষ্ট করে দেয়। ক্রোধের সমান পাপ নাই, ক্ষমার সমান তপ নাই, এজন্য বিবিধ প্রকার ক্ষান্তি ভাবনা করা উচিত। বুদ্ধগণ ক্ষান্তি ও তিতিক্ষাকে পরম তপস্যা ও নির্বাণকে পরমপদ বলেন। বোধিসত্ত্ব[৪] ক্ষান্তি পারমিতা অভ্যাস কালে অন্যদের অপরাধকে ক্ষমা করে দিতেন। কোনো অবস্থায় মনে বিকার উৎপাদন করতেন না, অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্রও মনে বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন না। সমস্ত কষ্ট সহ্য করতেন (জিতেন্দ্র লাল, ২০০১ : ১৩৩)। 'ক্ষান্তি' পারমিতা কীভাবে পূরণ করতে হয় এর একটি সুন্দর উদাহরণ '*মজ্ঝিম নিকায়ে*' ককচোপম-সূত্রে[৫] দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে বুদ্ধ বলেছেন, "ভিক্ষুগণ, চোর ডাকাত যদি করাত দ্বারা

তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ছেদন করে, তথাপিও তোমরা মনকে দূষিত করবে না"(ধর্মাধার, বেণীমাধব ও বিনয়েন্দ্রনাথ, ২০১৮ : ১৯৫)। তোমরা এরূপ শিক্ষা করবে: "আমি আমার চিত্তকে বিকারযুক্ত হতে দিব না; দুর্বাক্য ব্যবহার করব না। মৈত্রীভাবের দ্বারা সদা অন্যের হিতানুকল্পী হয়ে বিহার করব। কিছুতেই আমার চিত্তে দ্বেষভাব উৎপাদন করব না। বিশ্বের সকলের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করব। মাতা যেমন তাঁর জীবনের বিনিময়েও একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষা করেন, সেরূপ অপরিসীম মৈত্রী শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি পোষণ করবে" (ধর্মাধার, বেণীমাধব ও বিনয়েন্দ্রনাথ, ২০১৮ : ১৯৫)। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে 'ক্ষান্তি' অভ্যাস করতে হবে সে সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন, "যদি কেহ তোমার সম্মুখে তোমারই অখ্যাতিমূলক কোনো কথা বলে, তথাপি যা গৃহী জনোচিত ছন্দ, যা গৃহী জনোচিত বিতর্ক তা পরিত্যাগ করবে এবং এইরূপ শিক্ষা করবে, এটাতে তোমার চিত্ত বিকার প্রাপ্ত হবে না, কোন পাপ বাক্য উচ্চারণ করবে না, সর্ব ভূতের হিতানুকল্পী হওয়া, মৈত্রী-চিত্তে দ্বেষ ব্যবধানে অবস্থান করবে" (ধর্মাধার, বেণীমাধব ও বিনয়েন্দ্রনাথ, ২০১৮ : ১৯৫)। 'বুদ্ধবংস' গ্রন্থে বুদ্ধাঙ্কুরের 'ক্ষান্তি' পারমির অনুশীলনে উজ্জীবিত হয়ে সম্বোধি লাভের পরামর্শ হিসেবে বলা হয়েছে

যথাপি পঠবী নাম সূচি পি অসূচিং পি চ,
সব্বং সহতি নিক্খেপং ন করোতি পটিঘং দযং।
তথেব ত্বং পি সব্বেসং সম্মানাব মানক্খমো
খন্তি পারমিতং গন্ত্বা সম্বোধিং পাপুনিসম্পি।

(ধর্মতিলক, বিনয়াচার্য্য, প্রজ্ঞালোক, আর্যবংশ ও জ্যোতিঃপাল, ১৯৩৪ : ১৪২-১৪৩)

অর্থাৎ পৃথিবীতে যেমন-শুচি-অশুচি নানাবিধ বস্তু নিক্ষেপিত হলেও পৃথিবী নিরবে সহ্য করে, নিক্ষেপকারীর প্রতি দয়া বা ক্রোধ কোন কিছুই প্রদর্শন করে না, সেরূপ সকল মান-অপমান সহ্য করে এবং বিষয়ে নিবৃত্ত থেকে 'ক্ষান্তি' পারমি পূর্ণ করে সম্বোধি লাভ করতে হবে।

'ক্ষান্তি' ও 'বীর্য' পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। বীর্যকে ক্ষান্তির অলংকার হিসেবে অভিহিত করা হয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ভবের পেছনে ক্ষান্তিই মূল নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। প্রকৃত বিষয়তত্ত্বাদি অবগত হওয়ার জন্য এবং চিত্তে শুভ ও অশুভ বৃত্তি উৎপত্তি লাভ করে। এর মাধ্যমে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। বোধিচিত্তের সাধকগণ সর্ববিধ মান-অপমানে বিচলিত হন না, শান্ত থাকেন, মানসিক আচরণগত তাদের কোন পরিবর্তন হয় না। 'ক্ষান্তি' পারমির প্রভাবেই তা সম্ভব হয়।

'ক্ষান্তি' একটি অহংবোধ হীন কর্ম প্রচেষ্টা। তাই ক্ষান্তির মাধ্যমে কর্ম অনুশীলনে গর্ব না করাই উত্তম। পূর্বের কোন ঋণ পরিশোধ করার প্রবণতা বা মানসিকতা ধারণ করেই 'ক্ষান্তি' প্রদর্শন করা উচিত। একই সাথে নিজেরই একটি কর্তব্য কর্ম হিসেবে গণ্য করতে হবে। এমন করেই চিত্তে ক্ষান্তির প্রসারতা ও ব্যপকতা লাভ করে থাকে।

## ৪. ক্ষান্তির শ্রেণিবিন্যাস

ক্ষান্তি তিন প্রকার। যথা:

৪.১ দুঃখাধিবাসনা ক্ষান্তি;

৪.২ পরাপকারমর্ষণ ক্ষান্তি ও

৪.৩ ধর্ম নিধ্যান ক্ষান্তি।

## ৪.১ দুঃখাধিবাসনা ক্ষান্তি

'যে অবস্থায় অত্যন্ত অনিষ্টের উৎপত্তি হলেও দৌর্মনস্য বা মানসিক অশান্তির উৎপত্তি হয় না তাকে 'দুঃখাধিবাসনা ক্ষান্তি' বলে অভিহিত করা হয়। দৌর্মনস্যের প্রতিপক্ষরূপে যত্নপূর্বক 'মুদিতা' বা মানসিক প্রফুল্লতা অভ্যাস করতে হয়। সাধককে এইরূপ বিচার করে দৌর্মনস্য দূর করতে হবে। একেবারেই যা ইচ্ছা করি না এমন পরম অনিষ্টও যদি কিছু আমার নিকট আসে তথাপি আমার মুদিতা[৬] ক্ষুব্ধ হবে না। কারণ, প্রফুল্লতা নষ্ট করে দৌর্মনস্য আশ্রয় করলেও আমার অভীষ্ট ফল হবে না; উপরন্তু যা কুশল তাও নষ্ট হবে। যদি অনিষ্ট প্রাপ্তি এবং ইষ্ট ব্যাঘাতের উপায় থাকে তা হলেও দুর্মনা না হয়ে প্রতিকারের চেষ্টা করা উচত' (জ্যোতি পাল, ১৯৯৪ : ৩০)।

## ৪.২ পরাপকারমর্ষণ ক্ষান্তি

অন্যের কৃত অপকার সহ্য করা এবং অপকারীর অনিষ্ট না করা-এটিই 'পরাপকারমর্ষণ ক্ষান্তি'। কেউ অপকার করলে স্বভাবতই তার উপর আমার ক্রোধ জন্মে এবং প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রবৃত্তি হলেও তা জয় করতে হবে, আচার্য্য শান্তিদেব তাই নির্দেশ করেছেন। "যখন কেউ দণ্ডাদি নিক্ষেপ করে আমাকে আঘাত করে, আমি ঐ দণ্ডাদির উপর ক্রুদ্ধ হই না, এরূপ দণ্ডাদি যার দ্বারা প্রেরিত হয়, তার উপরই ক্ষুব্ধ হই" (জ্যোতি পাল, ১৯৯৪ : ৩১)।

মুখ্যং দণ্ডাদিকং হিত্বা প্রেরকে যদি কুপ্যতে।

দ্বেষেণ প্রেরিতঃ সোহপি দ্বেষে দ্বেষ্যেহস্ত মে বরম।।

(জ্যোতি পাল, ১৯৯৪ : ১০২)

অর্থাৎ মূখ্য দণ্ডাদিকে ত্যাগ করে যদি আমি তার প্রেরকের উপর ক্রুদ্ধ হই, তবে দ্বেষের প্রতিই তো আমার বিদ্বেষ হওয়া উচিত। কেননা সেই দণ্ডাদির প্রেরকও দ্বেষের দ্বারাই প্রেরিত হয়ে থাকে।

### ৪.৩ ধর্মনিধ্যান ক্ষান্তি

ধর্ম বা পদার্থের স্বরূপ চিন্তনের দ্বারা ও 'ক্ষান্তি' বা ক্ষমাশীলতার অনুশীলন করা যেতে পারে (জ্যোতি পাল, ১৯৯৪ : ৩১)।

ন চ দ্বেষ সমং পাপং ন চ ক্ষান্তি সমং তপঃ।
তস্মাত্ক্ষান্তিং প্রযত্নেন ভাবযে দ্বিবিধৈর্ণয়ৈঃ।।

(জ্যোতি পাল, ১৯৯৪ : ৯৫)

অর্থাৎ দ্বেষের সমান পাপ নাই এবং ক্ষমার সমান তপস্যা বা পুণ্য নাই। অতএব, বিবিধ উপায়ে এবং পরম যত্নে ক্ষমা ধর্মের সাধনা করা উচিত।

"আমি নিজেকে সকলের সেবক মনি করি। লোকে ইচ্ছা করত আমার মস্তকের উপর পা রাখুক। আমি প্রসন্নতা পূর্বক তা শিরে ধারণ করব। তথাগতের আরাধনা, এই সম্যক স্বার্থ সাধনা, এই লোক দুঃখ অপনোদন, এই আমার ব্রত" (জ্যোতি পাল, ১৯৯৪ : ১১৬)।

### ৫. ক্ষান্তি অনুশীলনের অন্তরায়

'ক্ষান্তি' অনুশীলনের মূল অন্তরায় হলো ক্রোধ। ক্রোধ চেতনা আরো বলবতী হয় মূলত লোভ-দ্বেষ ও মোহের চর্চা ও সংযুক্ততার মাধ্যম। ধিক্কার, মন্দ কথা, অখ্যাতি ইত্যাদি দেহকে আঘাত করে না। অমূর্ত চিত্তকেও আঘাত করতে পারে না। তারপরও প্রশ্ন জাগে, চিত্ত কেন ক্রুদ্ধ হয়। তাই বোঝা উচিত যে, ভালোবাসার মধ্যে বেঁচে থেকে পাপক্ষয় ও পুণ্যার্জন করা সম্ভব। তাই ভালোবাসার জন্য ভালোবাসার ব্যাঘাতকারীর উপর রাগান্বিত হয়ে পুণ্যক্ষয় এবং পাপার্জন করা সঠিক কার্য হবে না। যারা আমাদের পোষ্য তাদের উপর রুষ্ট না হওয়া উত্তম। যদি কোনো কিছুর দ্বারা কারো কোন কাজে বিঘ্ন হয় তবুও কারো উপরে রাগান্বিত হওয়া উচিত নয়। কেননা ক্ষমার সমান পুণ্য নাই।

কোপার্থ মেবমেবাহং নরকেষু সহস্রশঃ।
কারিতো হস্মি ন চাত্মার্থঃ পরার্থো বা কৃতো ময়া।।
(জ্যোতি পাল, ১৯৯৪ : ১০৭)

অর্থাৎ এই ক্রোধের কারণে আমি বহু সহস্রবার নরকে পতিত হয়েছি। এটি দ্বারা আমি নিজের বা অপরের মঙ্গল সাধান করতে পারি নাই।

সুতরাং ক্ষমা করাই উত্তম কর্ম বলে স্বীকার্য।

ক্রোধ উৎপত্তির মূল কারণ হলো স্বার্থ। আবার মানুষের হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যাওয়ার পেছনে দায়ী হলো ক্রোধ। ক্রোধান্ধ ব্যক্তি নিজের ও পরের ক্ষতি সাধন করে থাকে, যা সে অনেক সময় বুঝতেই পারে না। ক্রোধ নানা রোগ ও আয়ুক্ষয়ের কারণ। জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য ক্রোধই যথেষ্ট। সর্বোতভাবে ত্যাগ করতে হবে ক্রোধ ও অহমিকা। তাইতো *ধম্মপদে* উক্ত হয়েছে

ক্রোধং জহে বিপ্পজহেয়্য মানং, সঞ্ঞোজনং সব্বমতিক্কমেয়্য,
তং নামরূপস্পিং অসজ্জমান্তি, অকিঞ্চনং নানুপতনিং দুক্খা।
(সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, ১৯৯৭ : ৮৩)

অর্থাৎ ক্রোধকে সংবরণ করো, অভিমান পরিহার করো, সকল সংযোজন অতিক্রম করো। নাম রূপে অনাসক্ত সেই অকিঞ্চন ব্যক্তিকে দুঃখে পড়তে হয় না। *ধম্মপদে*বলা হয়েছে

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং,
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।
(সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, ১৯৯৭ : ১৯)

অর্থাৎ শত্রুতার ৎদ্বারা শত্রুতা কখনও প্রশমিত হয় না, শত্রুহীনতার দ্বারা শত্রুতা প্রশমিত হয়। জগতে এটিই সনাতন ধর্ম। *ধম্মপদে* আরো উক্ত হয়েছে

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং।
(সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, ১৯৯৭ : ৮৩)

অর্থাৎ মৈত্রী দিয়ে ক্রোধকে জয় করবে, সাধুতা দিয়ে অসাধুকে জয় করবে, দান দিয়ে কৃপণকে জয় করবে। আর সত্য দিয়ে মিথ্যাবাদীকে জয় করবে।

ক্রোধের কারণে মানুষের সাত প্রকার দোষাগ্রস্থতার কথা উক্ত হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থ'অঙ্গুত্তর নিকায়ে'। যথা

১. ব্যক্তির চেহারার শ্রী বা সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়;
২. ঘুম নষ্ট হয়;
৩. ব্যক্তি সব সময় চঞ্চল বিধায় কোন বিষয়েরই সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে না;
৪. ভোগ্যবস্তুতে সন্তুষ্ট হয় না;
৫. সমভিব্যবহারী বা উপযুক্ত সঙ্গী পায় না;
৬. কারো সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলতে পারে না ও
৭. প্রায়ই অপরাধে যুক্ত হয় (সুমঙ্গল বড়ুয়া ওপ্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, ২০১৮ : ২১৫-২২১)।

উপরে উল্লিখিত সকল কর্মকেই 'ক্ষান্তি' সাধনার পরিপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। 'ক্ষান্তি' সাধনাকারী ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন থাকা জরুরী। একই সাথে ক্ষান্তিব্রতকে রক্ষার করার জন্য প্রয়োজনীয় চিত্তবৃত্তি গ্রহণ বা পদক্ষেপ নেওয়াও জরুরী। অপ-চিন্তা কখনই 'ক্ষান্তি' সাধনাকারীকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না যদি চিত্তে 'ক্ষান্তি' সাধনার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। সেই অপচিন্তা বা অপকর্ম যতই ভয়াবহ বা নির্মম হয়ে থাকুক না কেন।

## ৬. বৌদ্ধ জাতকে ক্ষান্তির চর্চা

জাতক কাহিনি হতে বুদ্ধের জীবনের নানা রকম ঘটনা জানা যায়। যেখানে থাকে শিক্ষণীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকে। যেগুলো বিভিন্ন আঙ্গিকে গুরুত্বের দাবী রাখে। নিম্নে 'ক্ষান্তি' বা ক্ষমা সংক্রান্ত ঘটনার প্রতিফলন উদাহরণসহ তুলে ধরা হলো : "জাতকের কাহিনিতে দেখা যায় যে, সুরাপানেমত্ত ক্রুদ্ধ বারাণসীরাজ কলাবু এক ক্ষান্তিবাদী তাপসরূপ বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করলেন, ক্ষান্তি কাকে বলে"? তাপস অকপটে বলেন, "লোকে বেত্রাঘাত, কটুবাক্য, অপমান কিংবা অপদস্ত করলেও মনে অক্রোধভাব রক্ষা করাই হলো 'ক্ষান্তি'।" তাপসের এই উত্তর রাজার নিকট অপছন্দনীয় হলো। রাজা সমস্ত বিষয়কে তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্যসহ গ্রহণ করে উক্ত তাপসের ক্ষান্তিব্রতের পরীক্ষা নিতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। প্রথমেই রাজা কণ্টক সমন্বিত বেত দিয়ে তাপসের গায়ে ঘাতক দ্বারা দুইহাজর (২০০০) বেত্রাঘাতের

আদেশ দিলেন। এতে তাপসের শরীরের চর্ম-মাংস ক্ষত-বিক্ষত হলো। রক্তস্রোতে রঞ্জিত হলো মাটি। এরূপ অবস্থায় রাজা জিজ্ঞেস করলেন- "তাপস এখন বল, তুমি কোন্ বাদী"? "মহারাজ আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি ভেবেছেন- চর্ম-মাংসের নিচে আমার ক্ষান্তি সংরক্ষিত কিন্তু মহারাজ, আমার ক্ষান্তি সেখানে নয়। আমার ক্ষান্তি আমার হৃদয়াভ্যন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত। তা চোখে দেখার সাধ্য কারো নেই"। এভাবেই উত্তর দিলেন তাপস। অতঃপর রাজা আরো ক্রুদ্ধ হয়ে ঘাতককে আদেশ দিয়ে ক্রমান্বয়ে তাপসের দু'টি হাত, দু'টি পা কাটলেন, নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করলেন। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন- "এখন বল, তুমি কোন্ বাদী"? উত্তরে তাপস পূর্বের মত ক্ষান্তিবাদী বলে উত্তর দিলেন। অনন্তর রাজা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে-তোমার ক্ষান্তি, তোমার কাছে থাক্ বলে বোধিসত্ত্বের বক্ষস্থলে পদাঘাত করে মৃত প্রায় তাপসকে রেখে রাগে, ক্ষোপে স্থান ত্যাগ করলেন। তখন রাজ্যের সেনাপতি এসে বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাত করে প্রার্থণা করলেন- 'প্রভু, আপনার প্রতি যিনি অত্যাচার করেছেন যদি ক্রুদ্ধ হন, তাঁর উপরই হবেন, দয়া করে অন্যের উপর হবেন না, রাজ্যের যেন বিনাশ সাধন না হয়। তা শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন- "আমার পীড়নকারী এই ক্রোধ সম্পন্ন রাজা চিরজীবি হউক"। এইরূপ মৈত্রী চেতনা পোষণ করে বোধিসত্ত্ব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। 'অপরদিকে রাজার এই অধর্ম সহ্য করতে না পেরে উদ্যান থেকে প্রাসাদের অভিমুখি রাজার গমন পথে ধরিত্রী বিদীর্ণ হয়ে রাজাকে গ্রাস করলো এবং অবীচি নরকে নিক্ষেপিত হলেন' (ঈশানচন্দ্র, ১৪২২ : ২৫-২৭)।

'দুষ্ট ব্রাহ্মণ পিণ্ডাচরণের গমন পথে ধর্ম সেনাপতি সারিপুত্র স্থবিরকে পরীক্ষা করার জন্য পিছনে সজোরে আঘাত করল তা অনুসন্ধান তো দূরে থাক্ পিছনেও ফিরে না তাকিয়ে সহনশীলতার দ্বারা নির্বিকারচিত্তে পুনঃ গমন করছিলেন। তা দেখে ব্রাহ্মণ অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক পিণ্ড গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করে নিজ আলয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন' (লোকাবংশ ভিক্ষু, ২০১৪ : ১২)।

'*মহাকপি জাতকে*' বর্ণিত হয়েছে যে, 'বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে কুপ থেকে উদ্ধার করার পর নিদ্রা যাচ্ছিলেন, সে সময়ে ব্রাহ্মণ এক খণ্ড পাথর দ্বারা বানরের মাথায় আঘাত করেন। মহাসত্ত্বের পারমির হেতু মাথা ফেটে গেল ঠিকই কিন্তু মৃত্যু ঘটেনি। পরে সেই বানররাজ মহাসত্ত্ব তাকে ক্ষমা করেন এবং পরবর্তী বৃক্ষ শাখায় শাখায় গমন পূর্বক বন হতে বাহির হবার পথনির্দেশনা দিলেন' (ঈশানচন্দ্র, ১৪২২ : ২১১-২১৪)।

'নগর বারবণিতা সিরিমা হিংসাবশতঃ উত্তরাকে গরম ঘি মাথায় ঢাললেও উত্তরা নির্বিকার চিত্তে সিরিমাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন' (লোকাবংশ ভিক্ষু, ২০১৪ : ১২)।

'ব্রহ্মদত্তের সময় তার এক অমাত্য রাজান্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট করেছিলেন; সেই অমাত্যের এক ভৃত্য আবার নিজের প্রভুর অন্তঃপুর দূষিত করেছিল। অমাত্য ভৃত্যের অপরাধ সহ্য করতে সমর্থ হয়ে তাকে নিয়ে রাজার নিকট বললেন, 'মহারাজ, এই ভৃত্য আমার সব কাজকর্ম দেখে কিন্তু এ আমার গৃহের বিশুদ্ধতা নষ্ট করেছে। তার বিষয়ে কি করা কর্তব্য'? (ঈশানচন্দ্র, ১৪২২ : ১৩০-১৩১)। এই প্রশ্ন করে অমাত্য একটি গাথা বললেন

*Atthi me puriso deva sabbakiccesuvyāvaṭo,*
*tassa c'; eko 'parādh'; atthi, tatthatvaṃ kin timaññasīti. || Ja_II:148 ||*
(*Fausboll, 1877-1896:207*)

অর্থাৎ আমার বাড়ির মধ্যে একজন লোক আছে, একজন উদ্যোগী চাকরও; সে আমানতের খেয়ানত করেছে, হে মহারাজা! বলুন-আমি কি করব? উত্তরে রাজা নিম্নের গাথাটি বললেন

*Amhākaṃ c'; atthipurisoediso, idhavijjati,*
dullabhoaṅgasampanno, khantirasmākaruccatīti.|| *Ja_II:149* ||
(*Fausboll, 1877-1896:207*)

অর্থাৎ আমারও একজন উদ্যোগী দাস আছে এবং এখানেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। সত্যিই! সকল গুণসম্পূর্ণ মানুষ পাওয়া খুবই কঠিন। তাই আমি ধৈর্য বা ক্ষান্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রতিটি জাতকে ক্ষান্তির কথাই প্রকাশ পেয়েছে।

### ৭. ক্ষান্তি চর্চার ধর্মীয় গুরুত্ব

দুঃখ সম্প্রযুক্ত এ পৃথিবীতে সুখোৎসব সৃষ্টি করতে হলে এটিকে বিভাজন করে নানা দেশ, নানা জাতি বা জনরূপে না দেখে এক অবিভাজিত পৃথিবী বা প্রাণিলোক হিসেবে দেখা উচিত হবে। একইভাবে দুঃখকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখাই উত্তম। অন্যথায় পৃথিবী হতে দুঃখ দূর করা দুঃসাধ্য বিষয় হওয়ার সম্ভবনা বেশি। বিচ্ছিন্ন সুখ আহরণের চেষ্টায় একে অন্যকে দুঃখ দিয়ে প্রত্যেকেই ঘোর দুঃখকে গ্রহণ করে থাকেন। আমাদের এ দেহ নানা অবয়বযুক্ত হলেও তা অখণ্ড বা অবিচ্ছিন্ন। তার অবয়ব হিসেবে

দেশ, জাতি ও ব্যক্তিকে গণ্য করা হয়। নানা অঙ্গ ভেদে বহুরূপ বিশিষ্ট এ দেহ যেমন আমাদের এক মনে করে চর্চা করতে হয় ঠিক তেমনি সুখ ও দুঃখ মিশ্রিত জীব জগৎকেও সেইরূপ এক ভেবে চর্চা করতে হয়।

কথং চিল্লভ্যতে সৌখ্যং দুঃখং স্থিত ময়ত্নতঃ।
দুঃখে নৈব চ নিঃসারঃ শ্চৈত স্তস্মাদ্ দৃঢ়ী ভব।।
(জ্যোতি পাল, ১৯৯৪ : ৯৬-৯৭)

অর্থাৎ সংসারে সুখ অল্পই লাভ করা যায়। কিন্তু দুঃখ বিনা যত্নে খুব সহজেই এসে পড়ে। সুতরাং দুঃখে অভ্যস্থ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। দুঃখ দেখে কাতর না হয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে। কারণ সংসার হতে জন্ম-মৃত্যু থেকে উদ্ধার পেতে হলে দুঃখকে বরণ করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কর্তব্য।

দুঃখে হপি নৈব চিত্তস্য প্রসাদং ক্ষোভযেদ্ বুধঃ।
সংগ্রামো হি সহ ক্লেশৈর্যুদ্ধে চ সুলভা ব্যথা।।
(জ্যোতি পাল, ১৯৯৪ : ৯৮)

অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি দুঃখের মধ্যেও চিত্তের প্রসন্নতাকে রক্ষা করবেন, বিকৃত হতে দিবেন না। কেননা ক্লেশের সাথে আমাদের যুদ্ধ। যুদ্ধতো পীড়াসুলভই।

এই মায়াময় পৃথিবীতে মায়াময় পদার্থের সাথে প্রতীত্যসমুৎপাদ[৭]নীতির সাদৃশ্য রয়েছে। জগতের যে কোনো বস্তু একটিকে অবলম্বন করে আর একটি উৎপন্ন হয়ে থাকে। একইভাবে পূর্ব বিষয়কে অবলম্বন করে অপরটি উৎপন্ন হয়। এমন করে একটির উৎপত্তিতে অপরটির উৎপত্তি এবং একটির নিরোধে অপরটির নিরুদ্ধ হয়। এমন উৎপত্তি ও নিরোধ কার্য-কারণ নীতির মাধ্যমে দুঃখের মিশ্রণ ঘটে থাকে। দুঃখ কোনো প্রাণির কাম্য হতে পারে না। দুঃখের নিরোধ সকলের কাম্য। সুতরাং দুঃখের কারণ ও নিরোধের উপায় উদ্ভাবনপূর্বক সর্ব দুঃখের নিবারণ সর্বতোভাবে হওয়া উচিত। আগুণের স্বভাব হলো অপরকে জ্বালিয়ে দেওয়া। আগুনে জ্বললেও কেউ আগুনের উপর রাগান্বিত হয় না। তেমনি অপরের অপকার করা ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানী নয় বলে এমন ব্যক্তির উপর রাগ করা উচিত কর্তৃব্য হবে না।

আমাদের জগৎ সংসারে সুখ ও দুঃখকে ভিন্নভাবে দেখার কোনো অবকাশ নেই। সবকিছুকে এককভাবে দেখা উচিত। সেকারণে ধর্মীয় জীবনে ক্ষান্তির চর্চাও সেভাবে হওয়া উচিত। *ধম্মপদে* বলা হয়েছে

খন্তী পরমং তপো তিতিক্খা, নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা,
ন হি পব্বজিতো পরূপঘাতী সমণো হোতি পরং বিহেঠয়ন্তো।
(সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, ১৯৯৭ : ৭২)

অর্থাৎ বুদ্ধগণ বলেন ক্ষমা ও সহিষ্ণুতাই উত্তম তপস্যা এবং নির্বাণই সর্বশ্রেষ্ঠ। পরঘাতী ব্যক্তি প্রব্রজিত হতে পারে না। পরপীড়নকারী ব্যক্তি শ্রমণও হতে পারে না।

তাই শাস্ত্রে ক্ষমাশীলতার পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে-প্রত্যেকমানুষের ক্ষমাশীল হওয়া উচিত, যেহেতু অক্ষমী পুরুষ শ্রুতাদিতে খেদ সহনে অসমর্থতার দরুন স্বীয় বীর্য নষ্ট করে। যার হৃদয়ে সতত দ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত তার শান্তি সুখ কোথায়? "হৃদয় দ্বেষরূপ কাটা বিদ্ধ হলে কখনও মানসিক শান্তি পাওয়া যায় না, সুখ অনুভব করা যায় না, এমন কি সুখ নিদ্রাও হয় না। দ্বেষদুষ্ট ব্যক্তি স্বীয় স্বামীকেও মারতে পারে যিনি ধন-মান দিয়ে চিরকাল আশ্রয় দিয়েছেন। দ্বেষ দ্বারা মিত্রও বিচলিত হয়, ধন দিলেও কেউ তার সেবা করে না। সুতরাং এমন কিছু নাই, যা দ্বারা ক্রোধি ব্যক্তি শান্তিতে বাস করতে পারে"(জ্যোতি পাল, ১৯৯৪ : ৯৫)। কারণ ক্রোধি ব্যক্তি সর্বদা চিন্তা করে এ কথা উল্লেখ করে *ধম্মপদে* বলা হয়েছে

অক্কোচ্ছিমং অবধিমং অজিনিমং অহাসিমে,
যে তং উপনয়হন্তি বেরং তেসং নসম্মতি।
(সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, ১৯৯৭ : ১৯)

অর্থাৎ আমাকে আক্রোশ করল, আমাকে প্রহার করল, আমাকে জয় করল এবংঅপহরণ করল, যারা এরূপ চিন্তা পোষণ করে, তাদের শত্রুতার উপসম হয় না। *ধম্মপদে* আরো উক্ত হয়েছে

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে,
যে তং উপনয়হন্তি বেরং তেসূপসম্মতি।
(সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, ১৯৯৭ : ১৯)

অর্থাৎ আমাকে আক্রোশ করল, আমাকে প্রহার করল, আমাকে জয় করল এবং অপহরণ করল, যারা এরূপ চিন্তা পোষন করে না, তাদের শত্রুতার উপসম হয়।

ক্ষান্তিকে পরম তপস্যা বলে বুদ্ধগণ চিহ্নিত করেছেন। বোধিসত্ত্বগণ তাঁদের প্রতি সম্ভাব্য অপমান, অপবাদ, আঘাত নিবৃত্তি করে সম্বোধিতে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষান্তির অনুশীলন করে থাকেন। ক্ষান্তির চর্চার মাধ্যমে জগতকে মহিমান্বিত করা যায়। একই সাথে

সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণফল প্রাপ্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এটি কল্যাণকর কর্মের অনুশীলন। সুখদায়ক পূনর্জন্ম ও অধ্যাত্মিক চর্চার সহায়ক। একই সাথে সফল একাগ্রতা ও সর্বোচ্চ জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে থাকে। এটি ইন্দ্রিয় আনন্দের সাথে অপবিত্রতা, পক্ষপাত, ভালোবাসার প্রতিদান এবং নিন্দনীয় আত্মপ্রসাদ হতে মুক্ত থাকতে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

বৌদ্ধ গ্রন্থে ক্ষান্তি রহিত ব্যক্তির পঞ্চবিধ দোষের কথা উল্লেখ রয়েছে। যথা:- ১. ক্ষমাহীন ব্যক্তি বহুজনের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হয়, ২. শত্রুবহুল হয়, ৩. ঘৃণিত হয়, ৪. অবজ্ঞানাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং ৫. মরণের পর দূর্গতি নরকে গমন করে। অপরদিকে ক্ষমাশীল ব্যক্তির পঞ্চবিধ গুণের কথা উল্লেখ রয়েছে। যথা:- ১. ক্ষমাশীল ব্যক্তি বহুজনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হন, ২. শত্রুহীন হন, ৩. সর্বজন প্রশংসিত হন, ৪. স্বজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করেন এবং ৫. মৃত্যুর পর স্বর্গ-সুগতি লোকে গমন করেন (ভদন্ত লোকাবংশ ভিক্ষু, ২০১৪ : ১২-১৩ )।

ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তায় মগ্ন থাকা মানুষের খুব সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তি স্বার্থ সিদ্ধি ও অন্যকে পীড়া দেওয়া এখন খুব স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরের জন্য আত্মদানের যে দৃঢ় সংকল্প ও ইচ্ছা সেইরূপ ধর্মীয় এবং মানবতার সাধনা হওয়া অত্যন্ত জরুরী। এই ধরণের ক্ষুদ্র জীবন ত্যাগ করে বৃহত্তর জীবনের সংকল্প থাকা শোভনীয়। এর মধ্য দিয়ে জগতের সকল প্রাণির হিত সুখ আনায়নের সুযোগ রয়েছে। একইভাবে মানবতার সেবা করা সম্ভব। যা ধর্মচর্চার ন্যায় উত্তম। যার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সুখের আসনে আসিন হবার সুযোগ রয়েছে। শুধুমাত্র এর চর্চা বা অনুশীলন করা কর্তব্য।

### ৮. ক্ষান্তি চর্চার সামাজিক গুরুত্ব

প্রাচীন কাল হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের মানব-প্রেমিক মনীষীগণ নানাভাবে চিন্তা-ভাবনা করে যাচ্ছেন কিভাবে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করে মানুষ নির্বিঘ্নভাবে সুখে-শান্তিতে বাস করতে পারে। যেখানে থাকবেনা কোনো শ্রেণি বা সম্প্রদায়। থাকবেনা কোনো জাতিগত স্বার্থপরতা ও ভেদ-বৈষম্য। মহামিলন তীর্থে মিলিত হতে পারবে সমাজের সকল মানুষ, দেশের সকল মানুষ এমনকি পৃথিবীর সকল মানুষ। এজন্য দরকার হবে ক্ষান্তির চর্চা করা। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনেও ক্ষান্তির অনুসরণের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। সামাজিক সম্প্রীতি বহুলাংশে বর্ধিত করার ক্ষেত্রেও 'ক্ষান্তি' চর্চার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এটির চর্চার মাধ্যমে পারস্পারিক সম্পর্কও সুদৃঢ় হয়। ক্ষান্তির অনুরূপ চর্চাকে

বহুলাংশে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তথাগত বুদ্ধ বলেছেন, 'সাধুতার দ্বারা অসাধুকে, ত্যাগের দ্বারা কৃপণকে, সত্যের দ্বারা অসত্যকে, সেবার দ্বারা রোগীকে জয় করতে হবে' (সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, ১৯৯৭ : ৮৩)।' ক্ষান্তি চর্চার মাধ্যমে রাগ-দ্বেষ ও মোহ দূরীভূত হবে। 'ক্ষান্তি' চর্চার মাধ্যমে রাগ-দ্বেষ ও মোহ দূরীভূত হবে। একজন অপর জনের সাথে প্রীতিময় সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভুল-ত্রুটি ও ভালো-মন্দ মিলিয়ে মানুষের জীবন। কিন্তু কারো ভুলে তার প্রতি ক্রোধ বা রাগ দেখানো, জেদ-উত্তেজনা কিংবা উগ্রতা প্রদর্শন ভীষণ নিন্দনীয় বলেই চিহ্নিত করা হয়। এগুলো মানুষকে বড় করে না বরং ছোট করে। এর বিপরীতে ক্ষমা মানুষের মান-মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। একজন সাধারণ মানুষ কাউকে ক্ষমা করে অসাধারণ মানুষ হয়ে যেতে পারেন। ক্ষমার মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা কমে না বরং বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সর্বোত্তম ব্যবহারকারী ও ধৈর্যশীল মানুষ ক্ষমাশীল হয়ে থাকেন। একই সাথে ক্ষমাশীল ব্যক্তি উদারপ্রকৃতির হয়ে থাকেন। এ ধরনের গুণ যাদের রয়েছে তাঁরা সমাজে সকলের কাছে প্রশংসা অর্জন করে থাকেন। ক্ষমাকারী ধৈর্যবান ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ অন্যের রূঢ় বা কটু কথাবার্তা কিংবা অশোভনীয় আচার-আচরণে কষ্ট পায়। ফলে একে অপরের মতবিরোধ তৈরি হয়ে থাকে। অনেক সময় মতবিরোধ ও মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে পরস্পরের মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।তাই ক্ষমা, দয়া ও ভালোবাসার ওপর সমানভাবে গুরুত্বারোপ করা দরকার। সামাজিক শৃঙ্খলার স্বার্থে দরকার সুবিচার, আইন এবং আরো অনেক কিছু। কিন্তু ক্ষমা মানুষের মধ্যে সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পাশাপাশি ক্ষতির উপসম করে মানুষের মধ্যে আরো সুন্দর ব্যবহার ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে।সুতরাং আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে 'ক্ষান্তি' বা ক্ষমার প্রতিফলন থাকা উচিত। যার ফলে একটি সুন্দর সমাজ, দেশ ও জাতি বির্নিমাণে সহায়ক হবে এ কথা খুব সহজেই অনুমেয়।

## ৯. উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, 'পারমি' পূরণের ব্রতধারী অথবা বুদ্ধত্ব লাভে অভিপ্রায় আছে এমন বোধিসত্ত্ব অথবা সাধারণ মানুষ অর্থাৎ সকল শ্রেণির মানুষের জীবনেই ক্ষান্তির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় ও গুরুত্ববহ। জীবনে নানারকম ভালো কর্মের অধ্যাবসায় করতে হয়। ক্ষান্তিও জীবনের অধ্যাবসায় স্বরূপ বলে

গণ্য করা উচিত। চিত্তের শান্তি ও মৈত্রী সজীব রাখার জন্য ক্ষান্তির গুরুত্ব অপরিসীম যা বলার অপেক্ষা রাখে না। একইভাবে চিত্তের কোমলতা, শুদ্ধতা ও নিরাসক্ততা অটুট রাখার ক্ষেত্রে ক্ষান্তির প্রভাবই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ক্ষমাই জীবনের মূলমন্ত্র। এমন চিন্তার দ্বারা মন ক্ষান্তির আশ্রয় গ্রহণ করানো জরুরী। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ক্ষান্তির অনুশীলন দ্বারা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবাদ-বিসম্বাদ, শ্রেণি-সংঘর্ষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রশমিত করা যেমন সম্ভব তেমনি জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করাও অসম্ভব কোনো বিষয় নয়। সুতরাং জগতে 'ক্ষান্তি' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

## টীকা

১. স্থবিরবাদ বা হীনযান বৌদ্ধধর্মে সর্বাধিক প্রাচীন ও প্রামানিক বুদ্ধোপদেশ, যা পালি ভাষায় লিখিত এবং ত্রিপিটকে সংগৃহীত ও সুরক্ষিত। এতে বুদ্ধের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, তাঁর মানবীয় স্বরূপ স্পষ্টতম শব্দে অভিব্যক্ত হয়েছে। স্থবিরবাদ বিচার ধারাতে বুদ্ধের মানবীয় স্বরূপের ভরপুর রক্ষা করা হয়েছে। স্থবিরবাদ সাহিত্যে যদিও বুদ্ধকে শ্রেষ্ঠমানা হয়েছে, তথাপি তিনি জন্ম, জরা, ব্যধি, মৃত্যুর অতীত ছিলেন না। তাঁর জন্ম, বাল্যক্রীড়া, গৃহত্যাগ, মারবিজয় প্রভৃতিতে অনেক অদ্ভূত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল; তথাপি তিনি কোনো দিন লোক-ত্রাতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন দেবমানবের শাস্তা তথা জ্ঞানমার্গের প্রদর্শক। স্থবিরবাদ বিচার ধারার দর্শনও ছিল সরল। সমস্ত মানসিক এবং ভৌতিক বিশ্বই অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। এরা নামরূপেরই সমষ্টি মাত্র, যাকে পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়েছে, যথা- রূপ, বেদনা, সজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এভাবে ব্যক্তি যখন বস্তুর যথার্থ স্বরূপ অবগত হন, তখন তিনি সাংসারিক জীবন ত্যাগের চেষ্টা করেন; কারণ ঈদ্‌শ জীবনে কোনো তত্ত্ব অবশিষ্ট থাকে না। তখন তিনি শাশ্বতদৃষ্টি এবং উচ্ছেদদৃষ্টি, এই উভয় অন্ত পরিহার করেন। এক অন্তভোগ লিপ্সা, অন্য অন্ত আত্মপীড়ন, এই উভয় অন্ত ত্যাগ করে মধ্যম মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাকে আর্য-অষ্টাঙ্গিকমার্গ বলা হয়। এই আর্য-অষ্টাঙ্গিকমার্গের অনুসরণে স্বীয় জীবনকে পরিচালিত করেন। তখন তিনি অনুভব করতে পারেন যে, সাংসারিক যাবতীয় দুঃখ তৃষ্ণার কারণেই উৎপন্ন হয়। এই তৃষ্ণার নিরোধ আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুসরণেই সম্ভব হয়। সেই আর্য-অষ্টাঙ্গিকমার্গ হলো-১. সম্যক দৃষ্টি, ২. সম্যক সংকল্প, ৩. সম্যক বাক্য, ৪. সম্যক কর্ম, ৫. সম্যক জীবিকা, ৬. সম্যক চেষ্টা, ৭. সম্যক স্মৃতি ও ৮. সম্যক সমাধি। আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলেই সাধক নির্বাণের স্থিতিতে পৌছেন, অর্থাৎ অর্হত্বপদ লাভ করেন। অতএব স্থবিরবাদীর আদর্শ হলো সমস্ত দুঃখরাশির অন্ত করত অর্হত্বপদ লাভ করে অমর চিরশান্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ করা।

২. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের শত বৎসর পর বৌদ্ধধর্ম স্থবিরবাদ এবং মহাসাংঘিক এই দুই প্রধান সমপ্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের মধ্যে মহাসাংঘিক নিকায় বাদীরাই পরিবর্তিত হয়ে খৃঃ

পৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দী হতে খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দির মধ্যে এমন কতকগুলো সূত্রগ্রন্থ রচনা করেন, যা হতে কালান্তরে মহাযান মতের উৎপত্তি হয় এবং খৃস্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র উত্তর ভারত মহাযানময় হয়ে উঠে। মহাসাংঘিকেরা কৌশাম্বীতে যে বিভেদের বীজ বপন করেছিলেন, কালক্রমে তাই মহাযান রূপ মহীরূহে পরিণত হয়; যার ফল স্বরূপ এক বিশাল সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। মহাযান সম্প্রদায়ের নিজেস্ব কোন ত্রিপিটক ছিল না, সম্ভবও নয়। কারণ মহাযান কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের নামও নয়। এর অন্তর্ভূক্ত অনেক সম্পদ্রায় ছিল, তাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক সিদ্ধান্ত সূত্র ছিল (ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী, *মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন*, নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রাম, ১৯৭৮, পৃ. ৬৯)।

৩. বৌদ্ধ শাস্ত্রে মানবতার পূর্ণ বিকাশের জন্য বিশিষ্ট সাধন-প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে, যার নাম 'পারমিতার সাধনা'। 'পারমিতা' শব্দের অর্থ যা পারে গিয়েছে অর্থাৎ সর্বাপ্রেক্ষা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়েছে। চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত দান, শীল ইত্যাদি দান-পারমিতা, শীল-পারমিতা প্রভৃতি নামে অবিহিত হয়। সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্রে 'পারমিতা' শব্দটি পালি বৌদ্ধ শাস্ত্রে 'পারমি' নামে কথিত হয়। এইরূপ উক্ত আছে যে, গৌতম বুদ্ধ তাঁর পূর্ব জন্মে নিম্নলিখিত দশবিধ সদ্গুণের বিকাশ সাধন করতে করতে গৌতম সিদ্ধার্থ জন্মে 'দশ পারমিতা' পূর্ণ করে সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছিলেন। জীবনের অবশ্যম্ভাবী দুঃখ মুক্তির ব্রতে বোধিসত্ত্ব আচরিত জীবন প্রণালীই পারমি। বোধিসত্ত্বগণ এ আচরণ পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকেন। সম্যক সম্বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ ও শ্রাবকবুদ্ধগণ সকলেই তাঁদের আত্মোৎসর্গকৃত কর্ম চৈতন্যে এই পারমী প্রক্রিয়া শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সাথে সম্পাদন পূর্বক স্ব-স্ব অবস্থানে উন্নীত হয়েছেন। দুঃখ মুক্তি অন্বেষণে বুদ্ধ নির্দেশিত এটি একটি পরিশীলিত পথ। এর বিস্তৃত ব্যাখ্যাকে বলা হয় পারমীতত্ত্ব। যা অন্যভাবে বলা যায় যে, তথাগত গৌতম বুদ্ধ তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা লব্ধ প্রচেষ্টায় অর্জিত অভিজ্ঞতা ও অন্তিম জন্মে বুদ্ধত্ব লাভোত্তর অধিগত জ্ঞানের আলোকে ভাষিত দুঃখ মুক্তিসম্পন্ন সফল জীবন পথ অন্বেষণের ব্রতচর্যার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষিত ধারাই হলো পারমিতত্ত্ব।

৪. বোধির লালনকারী সত্ত্বই 'বোধিসত্ত্ব'। 'বোধি' শব্দের অর্থ জ্ঞান, সম্যক (সঠিক) জ্ঞান, সর্বোচ্চ জ্ঞান। সর্ব জীবের মুক্তি মার্গ অন্বেষণের প্রক্রিয়া যে জ্ঞান প্রভায় জাগ্রত হয় সেই জ্ঞান। কর্মে ও মননশীলতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জ্ঞান। বুদ্ধ জগতের সাধনার মাধ্যমে সর্ব পারমি পূরণ পূর্বক বুদ্ধত্বে উন্নীত হয়েছিলেন। সে হিসেবে বলা যায়, 'বোধিসত্ত্ব' জ্ঞানচর্যার প্রত্যয় অভীপ্সা হলো সম্যক সম্বুদ্ধত্ব বা পরম আকাঙ্খিত সম্যক বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভের ক্ষেত্র বা উপযুক্ত ভূমি এবং বুদ্ধত্বে উন্নীত হওয়া হলো সাধন মার্গের ফসল। আরও সহজভাবে বলা যায়, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে বুদ্ধত্ব লাভে অভিলাষী এবং এর লক্ষ্যে সাধনাকারী 'বোধিসত্ত্ব' নামে পরিচিত। তাই বলতে হয় বোধিসত্ত্বের সাধনা অত্যন্ত দূর্লভ। পূর্ব জীবনের সাধন মাত্রিক সংস্কারের কারণেই বোধিসত্ত্ব জীবন লাভ করা যায়। সে চেতনাদীপ্ত সত্ত্বগণ জন্ম-জন্মান্তরে যেখানেই জন্ম গ্রহণ করুন না কেন তাঁদের মেধা, মনন, চিন্তায় ও কর্মে তাঁরা ক্রমশই উর্ধ্বগতি সম্পন্ন হয়। সুমন কান্তি বড়ুয়া, *বৌদ্ধ দর্শনে পারমিতত্ত্ব*, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২২-২৩।

৫. ককচ দুই দিকে বাঁটযুক্ত এক প্রকার তীক্ষ্ম অস্ত্র বিশেষ। কচকচ করে কাটে বলে এটির নাম ককচ বা কচকচ।

৬. ব্রহ্মবিহার সাধনার তৃতীয় স্তর হলো মুদিতা। শুধুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ নয়, অন্যের সুখের মধ্যেই নিজে আনন্দ ও সুখ লাভ করাই হলো মুদিতা। মানুষের যখন কোনো প্রকার স্বার্থবোধ থাকে না, শুধুমাত্র তখনই মানুষ পারে অপরের সুখে সুখী হতে। সাধনার এ স্তরে উন্নীত হতে পারলে তখন নিজের সাথে অন্যের কোনো তফাৎ আর থাকে না। আপন-পর একাত্ম চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার নাম মুদিতা।

৭. প্রতীত্যসমুদপাদ বৌদ্ধ দর্শনে বিশিষ্ট স্থান লাভ করে আছে। বুদ্ধের আবিষ্কৃত চারটি আর্যসত্য ও অপরাপর বুদ্ধ দার্শনিক মতবাদ, এ দার্শনিক তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ মতবাদের মাধ্যমেই বুদ্ধ জীবন ও জগতের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং দুঃখ উৎপত্তির জটিল বিষয়াদির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রতীত্যসমুৎপাদ সমগ্র বৌদ্ধ দর্শনের আধার বা আশ্রয়। বস্তুত বৌদ্ধ দর্শন হৃদয়ঙ্গম করার এটাই একমাত্র চাবি। এ কারণে বুদ্ধ বলেছেন, "যিনি প্রতীত্যসমুৎপাদকে দেখেন, তিনি ধর্মকে দেখেন, যিনি ধর্মকে দেখেন, তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদকে দেখে থাকেন (জিতেন্দ্র লাল, ২০০১ : ২৬)।" প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ হলো যে কোনো বস্তু বা ঘটনার পূর্ববর্তী বস্তু বা ঘটনা থেকে উৎপন্ন হওয়া। বুদ্ধের মতে, এ জগতের প্রতিটি জিনিস, দৈহিক বা মানসিক, অবশ্য স্বীকার্য কার্যকারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ। কোনো কিছুই বিনা কারণে বা আকস্মিকভাবে ঘটে না বা উৎপন্ন হয় না। এ জগতে কোনো বস্তু বা ঘটনা আত্মনির্ভর নয়। প্রতিটি বস্তু বা ঘটনার কারণ আছে। জাগতিক সকল বস্তুই এক সর্বব্যাপক ও অবশ্যস্বীকার্য 'কার্যকারণ' নিয়মের অধীন (জিতেন্দ্র লাল, ২০০১ : ২৬)। বিজ্ঞানে একটি অবশ্যস্বীকার্য তত্ত্বের নাম কার্যকারণ সম্বন্ধ। এই কার্যকারণ সম্বন্ধের উপর উক্ত বৌদ্ধ তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধমতে এই কার্যকারণ নিয়ম জগতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ আকাশে মেঘ হওয়ায় বৃষ্টিপাত হলো, বৃষ্টিপাত হওয়ায় রাস্তা পিচ্ছিল হলো, রাস্তা পিচ্ছিল হওয়ায় জনৈক পথচারী আছাড় খেল এবং আছাড় খাওয়ায় লোকটি আহত হলো। এখানে এক পশলা বৃষ্টির কারণ আকাশের মেঘ, রাস্তা পিচ্ছিল হওয়ার কারণ বৃষ্টিপাত, লোকটি আছাড় খাওয়ার কারণ রাস্তার পিচ্ছিলতা, লোকটির আহত হওয়ার কারণ হলো তার আছাড় খাওয়া। সুতরাং একটির সাথে অন্যটির সম্পর্কযুক্ত। যদি আকাশে মেঘ না হতো তাহলে বৃষ্টিপাত হতো না এবং অন্যসব ঘটনাগুলোও ঘটতো না। অত্রএব একটির কারণে অন্যটি ঘটছে। প্রত্যেক কারণেই এক যথাযথ কার্য আছে, সে কারণ থেকে তা উৎপন্ন হয়। জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৬।

## তথ্যনির্দেশ


১. জ্যোতি পাল স্থবির [অনূদিত] (১৯৯৪)। *আচার্য্য শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

২. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া (২০০১)। *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

৩. শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রী বেণীমাধব বড়ুয়া ও বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী [অনূদিত] (২০১৮)। *পবিত্র ত্রিপিটক (পঞ্চম খণ্ড) সূত্রপিটকে মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)*, বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি।

৪. শ্রী ধর্মতিলক স্থবির এবং বিনয়াচার্য্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ও শ্রীমৎ আর্যবংশ স্থবির এবং জ্যোতিঃপাল [সম্পাদিত] (১৯৩৪)। *বুদ্ধবংস*, মায়ানমার : রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস।

৫. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া (১৯৯৭)। *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

৬. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া ও ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু [অনূদিত] (২০১৮)। *পবিত্র ত্রিপিটক (দশম খণ্ড) সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)*, বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি।

৭. ঈশানচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত] (১৪১৯)। *জাতক প্রথম খণ্ড*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী।

৮. সুমন কান্তি বড়ুয়া (২০০৮)। *বৌদ্ধ দর্শনে পারমিতত্ত্ব*, ঢাকা : পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢা. বি.।

৯. ভদন্ত লোকাবংশ ভিক্ষু [সম্পা.] (২০১৪)। *চরিয়া পিটক ও দশ পারমী*, চট্টগ্রাম : মিরসরাই।

১০. ঈশানচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত] (১৪২২)। *জাতক তৃতীয় খণ্ড*, সপ্তম মুদ্রণ, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী।

১১. ঈশানচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত] (১৪১৯)। *জাতক দ্বিতীয় খণ্ড*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী।

১২. ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী (১৯৭৮)। *মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন*, চট্টগ্রাম : নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহার।

১৩. শ্রী শীলানন্দ ব্রহ্মচারী (১৩৮১)। *অভিধর্ম-দর্পণ*, উঃ ২৪ পরগণা : মধ্যম গ্রাম।

১৪. সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া (২০০০)। *ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।